بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ২৮ নবুয়্যত, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

তাবুক সফরের আরো যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা আজ বর্ণনা করব; বিগত খুতবাগুলোতে তা বর্ণিত হচ্ছিল। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, কতক মুনাফিক যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছিল এবং বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছিল। কিন্তু মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরও মুনাফিকদের (যুদ্ধে) না যাবার ব্যাপারে বিভিন্ন অজুহাত ও বাহানা বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়, বরং পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ছিল, যখনই তিনি সফর থেকে মদীনায় ফেরত আসতেন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তেন। তিনি (সা.) তাবুক থেকে ফিরে আসার বেলায় মদীনায় চাশতের সময় প্রবেশ করেন এবং প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি (সা.) যখনই সফর থেকে ফেরত আসতেন এমনটিই করতেন। নফল নামায শেষে তিনি (সা.) মসজিদে বসেন আর লোকেরা তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে যারা নিজেদের ঈমানের দুর্বলতা এবং কপটতার কারণে (তাঁর) সঙ্গে যায় নি, তারাও আসতে থাকে। বিশেষভাবে মুনাফিকরা, যাদের আশায় গুড়েবালি হয়ে গিয়েছিল– তারা অধিক লজ্জা ও অনুশোচনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কসম খেতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন ধরনের ওজর ও অজুহাত দেখাতে থাকে। জীবনিকাররা লিখেছেন, এরা প্রায় আশিজন ছিল। তবে কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর চেয়েও অধিক লোক ছিল। মহানবী (সা.) তাদের উপস্থাপিত বাহ্যিক অজুহাত মেনে নেন এবং তাদের বয়আত নেন আর তাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে সোর্পদ করেন। কিন্তু মুনাফিকদের এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য ছিল, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে ওহীযোগে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এরা এমন অপবিত্র মানুষ যে, খোদা কখনো তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। বস্তুত তাদের সম্পর্কে সূরা তাওবায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَعۡتَذِرُونَ إِلَيۡكُمۡ إِذَا رَجَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ قُل لَّا تَعۡتَذِرُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكُمۡ قَدۡ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنۡ أَخۡبَارِكُمۡ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ
تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

سَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ إِذَا ٱنقَلَبۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ لِتُعۡرِضُواْ عَنۡهُمۡ فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمۡ إِنَّهُمۡ رِجۡسٌ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ
يَكۡسِبُونَ

يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ لِتَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإِن تَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرۡضَىٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ

(সূরা আত-তাওবা: ৯৪-৯৬)

অর্থাৎ, **তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে তারা তোমাদের কাছে (নানান) অজুহাত প্রদর্শন করবে। তুমি বলো, 'তোমরা অজুহাত প্রদর্শন কোরো না, আমরা কখনো তোমাদের বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। এরপর অদৃশ্য ও**

দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবেন।' তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের সামনে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কসম খাবে যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। কাজেই, তোমরা তাদের উপেক্ষা করো। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলরূপে জাহান্নাম হবে তাদের ঠিকানা। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ জাতির প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।

তাবুকের যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চরম অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেন, যেমনটি এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। তিনি এই লোকদেরকে ফাসেক (তথা দুষ্কর্মপরায়ণ) আখ্যায়িত করেন। মহানবী (সা.)-কে তাদের জানাযার নামায পড়তে এবং কবরে গিয়ে দোয়া করতে বারণ করেছেন। আর এই নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছেন যে, ভবিষ্যতে তারা কোনো তাহরীক (বা আহ্বানে) অংশ নেবে না এবং কোনো যুদ্ধেও যোগদান করবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

(সূরা আত-তাওবা: ৮১-৮৫)

অর্থাৎ, **পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ লঙ্ঘন করে নিজ জায়গায় বসে থাকায় উল্লসিত। এমনকি তারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল এবং বলল, তোমরা প্রচণ্ড গরমে অভিযানকল্পে বের হয়ো না। তুমি বলো, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে বেশি উত্তপ্ত। হায়, তারা যদি বুঝত! অতএব তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাদের কম হাসা উচিত আর বেশি কাঁদা উচিত। অতএব আল্লাহ্ তোমাকে তাদের এক দলের কাছে যদি ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে যুদ্ধে বের হবার অনুমতি চায়, সেক্ষেত্রে তুমি বলো, তোমরা আর কখনো আমার সাথে জিহাদের জন্য বের হবে না এবং কখনো আমার সাথে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বাড়িতে বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে। অতএব এখন পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথেই বসে থাকো। আর তাদের কেউ যখন মারা যায় তুমি কখনো তার জানাযার নামায পড়ো না এবং তার কবরে দোয়ার জন্যও দাঁড়িও না, কেননা তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে। আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন বিস্ময়াভিভূত না করে। আল্লাহ্ তাদেরকে এসবের মাধ্যমে কেবল এ পৃথিবীতে শাস্তি দিতে চান এবং তিনি চান, কাফির থাকা অবস্থায় যেন তাদের প্রাণ বের হয়ে যায়।**

এগুলোও সূরা তাওবার আয়াত। তাবুক যুদ্ধে পেছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা ছিল চার ধরনের মানুষ। (প্রথমত) সৌভাগ্যশালী সেসব সদস্য, যারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে কোনো আবশ্যিক দায়িত্ব পালনের জন্য পেছনে থেকে যান। যেমন, হযরত আলী (রা.), ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) প্রমুখ; তারা প্রথম শ্রেণিভুক্ত

মানুষ। দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা তারা, যারা অক্ষম, অসুস্থ ও দুর্বল ছিলেন। তারা চরম অসহায় ও দরিদ্র ছিলেন এবং বাহন ইত্যাদি যোগাড় করার সামর্থ্য রাখতেন না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, সত্যিকার অর্থেই তারা নিরুপায় ছিল; এজন্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বরং যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা সর্বত্র আমাদের সাথেই ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পুরস্কার ও পুণ্যের মাঝে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তৃতীয় (দলটি ছিল) মুনাফিকদের, যাদের কর্মকাণ্ডের কঠোর নিন্দা করা হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে চিরকালের জন্য তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি, কঠিন শাস্তি এবং সাবধানবাণী অবতীর্ণ হয়েছে। চতুর্থত ছিল তারা, যারা কেবল অলসতার কারণে অংশগ্রহণ করে নি এবং পেছনে থেকে যায়। তাদের মধ্যে তিনজন সাহাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর তারা হলেন– হযরত কা'ব বিন মালিক, হযরত মুরারা বিন রবী এবং হযরত হিলাল বিন উমাইয়া। এই তিন সাহাবী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে:

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (সূরা আত-তাওবা:১১৮)

অর্থাৎ, আর পেছনে রেখে দেওয়া সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ্ তা'লা তওবা গ্রহণ করে অনুগ্রহ করেছেন)। এমনকি পৃথিবী যখন এর (সমস্ত) বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল আর তাদের কাছে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ল আর তারা উপলব্ধি করল, আল্লাহ্‌র (অসন্তুষ্টি) থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁরই আশ্রয় ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নাই। তখন তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন যেন তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লাই বারবার তওবা গ্রহণকারী, বার বার কৃপাকারী।

الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا অর্থাৎ সেই তিনজন যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল– তাদের ঘটনার বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: বুখারীর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) নিজেই এই পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে কোনো অভিযানেই যাওয়া বাদ রাখি নি যা তিনি করেছেন, কেবল তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া। হ্যাঁ, বদরের যুদ্ধেও আমি পেছনে রয়ে গিয়েছিলাম, তবে তিনি (সা.) এই যুদ্ধ থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেবল কুরাইশের কাফেলাকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; কিন্তু ফলাফল এটা দাঁড়ায় যে, যুদ্ধের পূর্বপরিকল্পনা না থাকার পরও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শত্রুর মুখোমুখি করে দেন। আর আমি আকাবার রাতেও মহানবী (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের ওপর অটল থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ও চুক্তি করেছিলাম। আর আমি সেই রাতের বিনিময়ে আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে চাই না। [তিনি মনে করতেন, আকাবায় করা বয়আতের অঙ্গীকার বদরের চেয়ে বড়ো বিষয়।] যদিও বদর মানুষের মাঝে বেশি প্রসিদ্ধ। আর আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি কখনোই এতটা শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম না, যতটা না আমি তাঁর (সা.) সাথে এই যুদ্ধে যাওয়া থেকে পেছনে রয়ে যাবার সময় ছিলাম। [এখন তিনি তাবুকের ঘটনার কথা বলছেন যে, সেই সময় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি বেশ সচ্ছল ও শক্তিশালী ছিলাম।] আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে আমার কাছে কখনোই উট যোগাড় হয় নি, আর এই যুদ্ধের সময় আমি দুটি উট যোগাড় করে নিয়েছিলাম। [এরপর তিনি বিস্তারিত বলছেন যে,] মহানবী (সা.) যখনই কোনো যুদ্ধের সংকল্প করতেন,

তখন তিনি তা গোপন রাখতেন এবং অন্য কোনো দিকে যাবার ভাব দেখাতেন। [মহানবী (সা.)-এর যুগে এটিই তাঁর যুদ্ধের সাধারণ নীতি ছিল।] কিন্তু যখন এই যুদ্ধ হয়, তখন মহানবী (সা.) প্রচণ্ড গরমের সময় এই যুদ্ধের জন্য বের হন এবং সামনে ছিল দীর্ঘ সফর, জনমানবহীন মরুভূমি এবং বিশাল সংখ্যক শত্রু। তিনি মুসলমানদের কাছে তাদের পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে অবহিত করে দেন; [এক্ষেত্রে তিনি গোপন করেন নি, বরং বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা এই যুদ্ধে যাচ্ছি;] যেন তারা যুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি (সা.) তাদেরকে সেই দিকটির কথাও জানিয়ে দেন যেদিকে তিনি যেতে চান। আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে প্রচুর মুসলমান ছিলেন এবং তাদের সংখ্যা লিখে রাখার মতো কোনো খাতা ছিল না। [হযরত কা'বের এ কথার অর্থ হলো, কোনো রেজিস্টার ছিল না এবং কারা কারা সাথে যাচ্ছে না যাচ্ছে তাদের নামধাম লেখা ছিল না।] হযরত কা'ব বলতেন, যারা অনুপস্থিত থাকতে চাইছিল তাদের মাঝে কেউই এমন ছিল না যে ধারণা করবে যে, তার অনুপস্থিতি মহানবী (সা.)-এর অজানা থাকবে; [অর্থাৎ যদিও (যাত্রাকারীদের নামধাম) কিছু লেখা হয় নি, তবুও এই ধারণা কারো মনে আসত না যে, অনুপস্থিত থাকলে তা তাঁর (সা.) অজানা থাকবে;] যতক্ষণ না তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার ওহী নাযিল হয়। আর মহানবী (সা.) এই যুদ্ধটি এমন সময় করেছিলেন যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়া ছিল মনোরম। মহানবী (সা.) সফরের প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করেন এবং তাঁর সাথে মুসলমানরাও। [এবার তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন,] আমি সকালে যেতাম যেন আমিও তাদের সাথে সফরের প্রস্তুতি নিতে পারি; [অর্থাৎ যাবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন;] কিন্তু আমি ফিরে আসতাম এবং কিছুই করা হতো না। অর্থাৎ অলসতা ছিল, প্রস্তুতি নেওয়া হতো না। আমি মনে মনে বলতাম, আমি তো প্রস্তুতি নিতে পারবই; কাল নিয়ে নেব। এই চিন্তাই আমাকে গড়িমসির মাঝে আটকে রাখে। এমনকি সেই সময় চলে আসে যখন মানুষের সফরের তাড়া পড়ে যায় এবং মহানবী (সা.) এক সকালে রওয়ানা হয়ে যান, আর মুসলমানরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হয়। অথচ আমি আমার সফরের প্রস্তুতির কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারি নি। আমি ভাবলাম, মহানবী (সা.)-এর যাবার এক বা দুই দিন পর প্রস্তুতি নিয়ে নেব এবং এরপর গিয়ে তাঁদের সাথে মিলিত হব। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি বাহিরে গেলাম জিনিসপত্র গোছাতে, কিন্তু আবার ফিরে এলাম এবং কিছুই করলাম না। পরের দিন আবার যাই এবং ফিরে আসি, কিছুই গোছানো হয় নি। এভাবেই চলতে থাকে। এদিকে সেনাবাহিনী দ্রুত সফর করে অনেক দূর এগিয়ে যায়। আমিও সংকল্প করি যে, রওয়ানা হব এবং তাদের ধরে ফেলব। হায়, যদি আমি এমনটা করতাম! কিন্তু আমার ভাগ্যে তা-ও জোটে নি।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) চলে যাবার পর যখনই আমি মানুষের মাঝে বের হতাম এবং তাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করতাম, তখন এই বিষয়টি আমাকে খুব ব্যথিত করত যে, আমি কেবল এমন লোকদেরই দেখতাম যাদের মাঝে কপটতা রয়েছে বলে সবাই জানত, নতুবা দুর্বলদের মধ্য থেকে এমন কাউকে দেখতাম যাকে আল্লাহ্ নিরুপায় আখ্যা দিয়েছেন। আর মহানবী (সা.)-ও যখন তাবুকে পৌঁছেন তখন আমাকে স্মরণ করেন। তিনি তাবুকে লোকদের সাথে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করেন, কা'ব কোথায়? বনু সালামার এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাকে তার দুটি চাদর এবং নিজের ডানে-বামে ফিরে তাকানো আটকে রেখেছে। [অর্থাৎ হয়ত অহংকার বা গর্বের কারণে আসে নি।] হযরত মুআয বিন জাবাল একথা শুনে, অর্থাৎ সেই সাহাবীর এই কথা শুনে বলেন, তুমি কা'ব সম্পর্কে কত–না মন্দ কথা বললে!

আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তাকে ভালো ব্যক্তি বলেই জানি। এটা শুনে মহানবী (সা.) নীরব থাকেন।

হযরত কা'ব বিন মালিক বলতেন, যখন আমার কাছে এই খবর পৌঁছে যে, তিনি (সা.) ফিরে আসছেন, তখন আমার দুশ্চিন্তা হয় আর আমি মিথ্যা কথা ভাবতে থাকি যে, আগামীকাল কী বলে বা কোন অজুহাত দেখিয়ে আমি তাঁর (সা.) অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচব? আমার পরিবারের প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ নিই। যখন বলা হলো, মহানবী (সা.) এসে পৌঁছেছেন– তখন আমার মন থেকে সমস্ত মিথ্যা চিন্তা উবে যায় এবং আমি বুঝতে পারি, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমি কখনোই তাঁর (সা.) অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারব না। তাই আমি তাঁর (সা.) কাছে সত্য কথা বলার সিদ্ধান্ত নিই। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আগমন করেন। যখন তিনি কোনো সফর থেকে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে যেতেন, সেখানে দুই রাকআত নামায পড়তেন এবং এরপর লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বসতেন। তিনি (সা.) যখন তা করেন, তখন পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা তাঁর কাছে আসে এবং ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করতে ও কসম খেতে থাকে। এমন লোকের সংখ্যা ছিল আশির কিছু বেশি। মহানবী (সা.) তাদের বাহ্যিক অজুহাত মেনে নেন, তাদের কাছ থেকে বয়আত নেন এবং তাদের ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করেন আর তাদের গোপন বিষয় আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দেন। এরপর আমি তাঁর কাছে আসি। আমি যখন তাঁকে (সা.) সালাম দেই তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির মতো মুচকি হাসেন। [অর্থাৎ হাসলেন, তবে তা অসন্তুষ্টির হাসি।] এরপর তিনি (সা.) বলেন, সামনে আসো। আমি অগ্রসর হই এবং তাঁর সম্মুখে বসে পড়ি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কোন বিষয়টি তোমাকে পেছনে আটকে রেখেছে? তুমি কি কোনো বাহন ক্রয় করো নি? তখন আমি বলি, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি মনে করি, আমি যদি আপনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে অবশ্যই (মিথ্যা) ওজর-আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে তার অসন্তুষ্টির হাত থেকে বেঁচে যেতাম, কেননা আমি বাক্‌পটু। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, আমি ভালো করে জানি, আজ যদি আমি আপনার কাছে এমন কোনো মিথ্যা কথা বলি যার ফলে আপনি হয়ত আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু অচিরেই আল্লাহ্ আমার প্রতি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর আপনার কাছে যদি সত্য কথা বলি যার ফলে আপনি হয়ত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু এর ফলে আমি আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা লাভের আশা রাখি।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার কোনো অজুহাত নেই। আল্লাহ্‌র কসম! এই অভিযানের পূর্বে কখনো এত শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম না যতটুকু আপনার (সা.) সাথে এই অভিযানে না গিয়ে পেছনে থাকার সময় ছিলাম। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সে তো সত্য কথা বলে দিয়েছে! তুমি এখন চলে যাও, যতদিন না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। [তিনি (সা.) বলেন, তুমি তো সত্য বলেছ; এখন এখান থেকে চলে যাও। আল্লাহ্ তোমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তোমার সাথে কী আচরণ করা হবে।] অতএব আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনু সালামার কতিপয় লোক আমাকে অনুসরণ করে। তারা আমাকে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ইতিপূর্বে কোনো অপরাধ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে কোনো অজুহাতও উপস্থাপন করতে পারলে না, যেমনটি পেছনে রয়ে যাওয়া অন্য ব্যক্তিরা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে? আর তোমার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষমাপ্রার্থনাই তো তোমার এই পাপ ক্ষমা করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ্‌র কসম! তারা আমাকে অনবরত ভর্ৎসনা করতে থাকে। এমনকি আমিও (মনে মনে)

ভাবলাম; [তিনি বলেন, তখন আমার সংকল্প বদলে গেল; অর্থাৎ ভাবলাম,] ফিরে গিয়ে আগের কথা প্রত্যাখ্যান করব যে, পূর্বে আমি যে কথা বলেছিলাম– তা ভুল ছিল। [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে কোনো অজুহাত দাঁড় করাবো।] তখন আমি আমার সাথিদেরকে জিজ্ঞেস করি, [অর্থাৎ যারা বলছিল– যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও, অন্য কোনো অজুহাত দেখাও;] আমি তখন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমার সাথে আর কেউ কি আছে যে তাঁর (সা.) সামনে আমার ন্যায় এমন সত্য কথা বলেছে? তারা বলে, হ্যাঁ, আরো দুইজন ব্যক্তি আছে; তারাও তা-ই বলেছে যা তুমি বলেছ। আর তাদেরকেও ঐ একই উত্তর দেওয়া হয়েছে যা তোমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি, তারা কারা? তারা বলে, একজন মুরারা বিন রবী আমরী এবং অপরজন হলেন হিলাল বিন উমাইয়া ওয়াকফী। তারা আমাকে এমন দুইজন পুণ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরা দুইজনই আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করে, তখন আমি চলে গেলাম। মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দেন। [অর্থাৎ আমি নতুন কোনো অজুহাত উপস্থাপন করার জন্য ফেরত যাই নি, বরং আমি বাড়িতে চলে গেলাম আর মহানবী (সা.) লোকদের সাথে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন; অর্থাৎ যারা সেই অভিযানে তাঁর (সা.) পেছনে রয়ে গিয়েছিল– তাদের সাথে।] লোকজন এমন আচরণ করতে লাগল যেন তারা আমাদেরকে চেনেই না। এমনকি এই (চেনা) পৃথিবীও আমার কাছে অচেনা মনে হতে লাগল; আমার সেই চিরপরিচিত পরিবেশ আর থাকল না। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করি। আমার অপর দুই সাথি দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় নিজেদের ঘরেই রয়ে যান এবং ঘরে বসে কাঁদতে থাকেন। আমি যেহেতু তাদের তুলনায় যুবক ছিলাম আর তাদের চেয়ে বিপদাপদ সহ্য করার শক্তিও বেশি রাখতাম, তাই আমি বাইরে বের হতাম ও মুসলমানদের সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করতাম এবং বাজারে চলাফেরা করতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আর আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপেও উপস্থিত হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর নিজ স্থানে বসে থাকতেন তখন তাঁকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতাম। আমি মনে মনে ভাবতাম, তিনি (সা.) কি আমার সালামের জবাবে ঠোঁট নেড়েছেন, নাকি নাড়েন নি? আমি চোখের কোণ দিয়ে তাকাতাম। আমি তাঁর (সা.) কাছে গিয়ে নামায পড়তাম আর আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। যখন আমি নামায পড়তে আরম্ভ করতাম তিনি (সা.) আমার দিকে তাকাতেন, আর যখন আমি তাঁর (সা.) দিকে তাকাতাম তখন তিনি (সা.) আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে লোকজনের এই কঠোর আচরণ অনেকদিন ধরে চলতে থাকায় সেটি আমার জন্য খুব অসহনীয় হয়ে গেল। অগত্যা আমি সেখান থেকে চলে গেলাম এবং আবু কাতাদার বাগানের দেয়ালে উঠে পড়লাম। তিনি আমার চাচাতো ভাই ছিলেন। [অর্থাৎ তার বাগানে আমি ঢুকে পড়লাম।] আর তিনি আমার কাছে সব মানুষের মধ্যে বেশি প্রিয় ছিলেন। [সদর দরজা দিয়ে না গিয়ে আমি সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে গেলাম।] তিনি বলেন, আমি তাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সালামের জবাবও দিলেন না। আমি বলি, আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি? তিনি নীরব রইলেন। আবার তাকে জিজ্ঞেস করি এবং কসম দিয়ে বলি, কিন্তু তিনি আবারও নীরব থাকেন। আমি তৃতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করি এবং কসম দিই; তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। একথা শুনে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। আমি পেছন ফিরে দেয়াল টপকে সেখান থেকে চলে আসি।

হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি যখন মদীনার বাজারের মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন দেখি সিরিয়াবাসী 'নাবাতী' কিছু লোক যারা খাদ্যশস্য বিক্রি করতে মদীনায় এসেছিল তাদের একজন জিজ্ঞেস করছে, কা'ব বিন মালিককে কেউ দেখিয়ে দেবে? একথা শুনে লোকেরা তাকে ইশারায় আমার দিকে নির্দেশ করে। সে আমার কাছে এসে আমাকে একটি চিঠি দেয় যা ছিল গাস্সানের বাদশার পক্ষ থেকে। তাতে লেখা ছিল: পরসমাচার এই যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, তোমার সাথিরা তোমার সঙ্গে কঠোর আচরণ করেছে এবং তোমাকে একঘরে করে রেখেছে। অথচ আল্লাহ্ তোমাকে এমন ঘরে জন্ম দেন নি যে, তুমি অপমানিত হবে বা তোমাকে বিনষ্ট করা হবে। তুমি আমাদের কাছে এসে সাক্ষাৎ করো, আমরা তোমাকে যথাযথ সম্মান দেবো। আমি যখন চিঠিটি পড়ি তখন (মনে মনে) বলি, এই চিঠি আরেকটি পরীক্ষা! এমনিতেই আমি একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আর এখন বাদশার পক্ষ থেকে এই লোভ দেখানো চিঠিরূপে আরেক পরীক্ষা এসে গেল। তিনি বলেন, আমি সেই চিঠি নিয়ে একটি চুল্লির কাছে যাই; সেখানে আগুন জ্বলছিল, আমি চিঠিটি তাতে ফেলে দিই।

যখন পঞ্চাশ রাতের মধ্যে চল্লিশ রাত পার হলে পরে দেখি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বার্তাবাহক আমার কাছে আসছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আমি কি তাকে তালাক দেবো, নাহলে কী করব? তিনি বলেন, (তালাক দেবে না,) শুধু তার কাছ থেকে পৃথক থাকো এবং তার কাছে যেয়ো না। তিনি (সা.) আমার দুই সাথিকেও একই কথা বলে পাঠান। আমি আমার স্ত্রীকে বলি, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও এবং সেখানেই থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীর ব্যাপারেও একই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল, হিলাল বিন উমাইয়া খুব বৃদ্ধ, তার কোনো চাকরবাকরও নেই। আপনি কি এটি অপছন্দ করবেন যদি আমি তার সেবাযত্ন করি, তার জন্য রান্নবান্না করে দিই, কাপড়চোপড় ধুয়ে দিই? তিনি (সা.) বলেন, না; কিন্তু সে যেন তোমার কাছে না আসে। তুমি শুধু এই সীমার মধ্যেই তার সেবা করতে পারো। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! তার তো এখন এমন কোনো অনুভূতিই নেই। আল্লাহ্র কসম! যেদিন থেকে এই ঘটনা তার সঙ্গে ঘটেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। কা'ব বর্ণনা করেন, আমার কিছু আত্মীয় আমাকে বলে, তুমিও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে একই রকম অনুমতি চেয়ে নাও যেন সে তোমার সেবাযত্ন করতে পারে, যেমনটি তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার সেবাযত্ন করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বলি, আল্লাহ্র কসম! আমি তো কখনোই এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আর কে জানে, এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে কী জবাব দেবেন? আমি তো একজন যুবক। [তিনি তো বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু আমি তো যুবক।]

তারপর আমি আরো দশ রাত অতিবাহিত করি, এমনকি রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করার পর পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে যায়। [অর্থাৎ একঘরে করে রাখার পুরো পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হলো।] পঞ্চাশতম রাতের সকালবেলা ফজরের নামায পড়ে আমি আমার ঘরগুলোর একটির ছাদে বসে ছিলাম। তখন আমার অবস্থা ঠিক তেমনটিই ছিল যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল আর পৃথিবী এর বিশালতা সত্ত্বেও আমার কাছে সংকুচিত মনে হচ্ছিল। এমন সময় আমি একজন

ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনতে পাই যে সালা’ পাহাড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বলছিল, হে কা’ব বিন মালিক! তোমার জন্য সুসংবাদ! আমি তা শুনেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং বুঝে যাই, বিপদ দূর হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের নামায পড়ে ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ্ তা’লা দয়াপরবশ হয়ে আমাদের ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে লোকেরা আমাদের কাছে সুসংবাদ জানাতে ছুটে আসে এবং আমার অন্য দুই সাথির কাছেও সুসংবাদাতারা যান। এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে আমার কাছে আসে, আর আসলাম গোত্রের আরেক ব্যক্তি দৌড়ে সালা’ পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল এবং তার কণ্ঠস্বর ঘোড়ার আগমনের চেয়ে দ্রুত পৌঁছেছিল। [অর্থাৎ একজন ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল আর অন্যজন পাহাড়ে উঠে জোরে ঘোষণা করে দিয়েছিল।] যখন সেই ব্যক্তি– যার কণ্ঠ আমি প্রথম শুনেছিলাম– আমার কাছে সুসংবাদ দিতে এলো, আমি আমার দুইটি কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম, কারণ সে-ই আমাকে (প্রথমে) সুসংবাদ দিয়েছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তখন সেগুলো ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। এরপর আমি আরেকজনের কাছ থেকে ধার করে দুইটি কাপড় নিই, সেগুলো পরে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যাই। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করছিল এবং তওবা কবুল হবার কারণে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। এটি বলছিল যে, তোমাকে অভিনন্দন! কেননা আল্লাহ্ তা’লা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তওবা কবুল করেছেন।

হযরত কা’ব (রা.) বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে পৌঁছাই। গিয়ে দেখি, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসে আছেন এবং লোকেরা তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছে। আমাকে দেখে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) ছুটে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউই উঠে আমার কাছে আসেন নি আর তালহার এই অনুগ্রহের কথা আমি কখনো ভুলব না। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বললে তিনি জবাব দেন আর তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি (সা.) বলেন, তোমার জন্য পরম আনন্দময় ও কল্যাণময় দিনের সুসংবাদ, যে দিনটি তোমার মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেবার পর আজ পর্যন্ত তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন। তিনি বলতেন, আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে? তিনি (সা.) বলেন, না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা এতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত যেন তা এক টুকরো চাঁদ, আর আমরা তা দেখেই বুঝতে পারতাম, তিনি (সা.) খুশি হয়েছেন। আমি তাঁর সামনে বসে পড়ে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার এই তওবা কবুল হবার বিনিময়ে আমার যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছি যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের খাতিরে কৃত সদকা বলে গণ্য হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমার সম্পত্তির কিছু অংশ নিজের জন্যও রাখো, কেননা এটাই তোমার জন্য শ্রেয় হবে। আমি বলি, তাহলে আমি আমার সেই অংশ রেখে দিচ্ছি যা খায়বারে রয়েছে। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা’লা আমাকে সত্য বলার কারণেই মুক্তি দান করেছেন। তাই আমার তওবার আবশ্যক অংশ হলো– যতদিন আমি বেঁচে থাকব সর্বদা সত্য কথাই বলব। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! আমার জানামতে এমন আর কোনো মুসলমান নেই যাকে আল্লাহ্ তা’লা সত্য বলার প্রেক্ষিতে সেভাবে তার পরীক্ষা নিয়েছেন যেভাবে তিনি আমার পরীক্ষা নিয়েছেন– সেই সময় থেকে– যখন থেকে আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেছি। যেদিন আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট একথা বর্ণনা করি– সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি জ্ঞানত কোনো মিথ্যা কথা বলি নি। আর আমি আশা পোষণ করি, ভবিষ্যতে যতদিন জীবিত থাকব আল্লাহ্ তা’লা

আমাকে (মিথ্যা বলা থেকে) সুরক্ষিত রাখবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি এ ওহী অবতীর্ণ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুল করে নবী এবং সেসব মুহাজির ও আনসারের প্রতি সদয় হয়েছেন যারা কঠিন সময়ে তার (অর্থাৎ এ নবীর) অনুসরণ করেছে; যদিও তাদের মাঝে এক দলের হৃদয় বক্র হবার উপক্রম হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি পরম স্নেহশীল ও বার বার কৃপাকারী। **(সূরা আত-তাওবা:১১৭)**

তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করার পর থেকে কখনোই এর চেয়ে বড়ো কোনো পুরস্কারে আমাকে ভূষিত করেন নি। আমি মহানবী (সা.)-কে সত্য কথা বলে দিয়েছিলাম। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, মহানবী (সা.)-কে মিথ্যা কথা বলি নি; নতুবা যারা মিথ্যা কথা বলেছিল তাদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম।

আর হযরত কা'ব বর্ণনা করতেন, আর যাদের অজুহাত মহানবী (সা.) মেনে নিয়েছিলেন– তাদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আমাদের তিনজন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা হয়; যখন তারা মহানবী (সা.)-এর সকাশে শপথ করে তখন তিনি (সা.) তাদের (নতুন করে) বয়আত নেন এবং তাদের ক্ষমা লাভের জন্য দোয়া করেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন যতক্ষণ না আল্লাহ্ ত'লা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। আর সেই সিদ্ধান্ত এটিই ছিল যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন: অনুরূপভাবে সেই তিনজনের প্রতিও তিনি অনুগ্রহ করেছেন যাদেরকে পেছনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। **(সূরা আত-তাওবা:১১৮)**। আর এখানে আল্লাহ্ তা'লা পেছনে রেখে দেবার ব্যাপারে যা বলেছেন তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের পেছনে রয়ে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেসব ব্যক্তির পেছনে রাখা যারা মহানবী (সা.)-এর সকাশে শপথ করেছিল ও তাঁর (সা.) নিকট (মিথ্যা) অজুহাত উপস্থাপন করেছিলেন, আর তিনি (সা.) তাদের অজুহাত মেনেও নিয়েছিলেন; কিন্তু আমরা সত্য কথা বলেছিলাম।

এখন যেহেতু আমি তিনজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করব, তাদের জানাযা পড়ানো হবে, তাই এর অবশিষ্ট অংশ যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন– তা পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

প্রয়াতদের স্মৃতিচারণের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে হাফেয মুহাম্মদ ইবরাহীম আবেদ সাহেবের, যিনি মুরব্বী সিলসিলা ছিলেন; সম্প্রতি ৭২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি চকওয়ালের একটি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র নিকট বয়আত গ্রহণ করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম জন্মগত অন্ধ ছিলেন। গ্রামেই কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। ১৯৬৭ সালে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন ও ১৯৭৭ সালে জামেয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি আরবী ফাযেল পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগে, এরপর মাদ্রাসাতুল হিফযের শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর ফয়সালাবাদের একটি গ্রামেও সেবা প্রদান করেন। এরপর ইন্দোনেশিয়ায় দুই বছরের জন্য মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগেও কাজ করেন। পরবর্তীতে দারুয যিয়াফত বিভাগে তাকে মুরব্বী হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। আর দৃষ্টিহীনদের যে কমিটি বানানো হয়েছিল তিনি ২০০০ সালে সে

কমিটির সেক্রেটারিও হন। তিনি খিলাফত লাইব্রেরিতেও সেবা প্রদান করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি ব্রেইল ভাষাও শিখেছিলেন। তার একজন সহপাঠী বাংলাদেশের মুরব্বী সিলসিলা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। তিনি বলেন, আমরা জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় একত্রে পড়াশোনা করেছি। হাফেয সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কোনো আয়াতের অংশবিশেষ পাঠ করে হাফেয সাহেবকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এই আয়াতটি পবিত্র কুরআনের কোন স্থানে রয়েছে? হাফেয সাহেব এক মিনিট চিন্তা করে বলে দিতেন, এই আয়াতটি অমুক সূরার শুরুতে অথবা মধ্যভাগে এসেছে। জামেয়াতে শিক্ষকরা যা পড়াতেন হাফেয সাহেব খুব ভালো স্মরণ রাখতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র বিশেষ স্নেহ ছিল তার প্রতি। সে কারণেই তিনি জামেয়াতে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষা অর্জন করেন নি। কিন্তু তবুও জামেয়াতে ভালো শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-রও হাফেয সাহেবের প্রতি অনেক স্নেহ ছিল।

একইভাবে হানিফ মাহমুদ সাহেবও তার ব্যাপারে অনেক কিছু লিখেছেন, কিছু বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, একবার আমি সাড়ে সাত বছর পর আফ্রিকা থেকে ফেরত আসি। আমি তার হাত ধরে জোরে চাপ দিলাম, কিন্তু কোনো কথা বলি নি। হাফেয সাহেব তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন এবং আমার নাম ধরে বললেন, কখন এসেছ? অর্থাৎ সাড়ে সাত বছর পরেও শুধু আমার হাতের স্পর্শ দ্বারা আমাকে চিনতে পেরেছেন। হাফেয সাহেব এ কথাও গর্বের সাথে বলতেন যে, পবিত্র কুরআন শোনাতে কোনো ভুল করব না। আর বাস্তবেই এটি সঠিক ছিল। অতঃপর হানিফ সাহেব এই ঘটনা লেখেন, এখানে তিনি জলসায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি আমাকে বলেন, আমি আপনাকে দেখে ফেলেছি। সে সময় আমি বললাম, আপনার তো দৃষ্টিশক্তি নেই, কীভাবে দেখলেন? তিনি বললেন, হৃদয়ের চোখ দিয়ে যা দেখেছি তা বাহ্যিক চোখ দেখতে পারে না। তার মাঝে অনেক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদির অনেক উদ্ধৃতিও তার মুখস্ত ছিল। এই ব্যাপারেও কয়েকজন লিখেছেন। প্রায় সাতচল্লিশ বছর যাবৎ জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্‌র কৃপায় মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র ও চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন, তার সন্তানদেরকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ লাইবেরিয়ার মোয়াল্লেম সিলসিলা শেখ আবু বকর জর্জ সাহেবের। সম্প্রতি তিনি ৭০ বছর বয়সে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কিছুদিন যাবৎ ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ১৯৮০ সালে সিয়েরালিওনে বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। জাগতিক দিক থেকে খুবই স্বচ্ছল ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে ধর্মসেবার অসাধারণ স্পৃহা সৃষ্টি করেন। ষাট বছর বয়সের পূর্বে তিনি পবিত্র কুরআন পড়তেন, কিন্তু এতটা নয়। কিন্তু এরপর বিশেষভাবে তিনি মনোযোগ দেন এবং খুব শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন পড়া শেখেন। এরপর অঙ্গীকার করেন, অবশিষ্ট জীবন ধর্মের সেবায় ব্যয় করবেন। যদিও তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন না। কিন্তু কার্যত তিনি সেই রূপ ধারণ করে দেখিয়েছেন যা ওয়াকেফে যিন্দেগীর চেয়েও বেশি ছিল। জামা'তের

সেবা ও তবলীগে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। এক বছরের মৌলিক শিক্ষা জামা'তের পক্ষ থেকে লাভ করেন, তাকে কনডেন্সড কোর্স (সংক্ষিপ্ত কোর্স) করিয়ে এরপর মোয়াল্লেম হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ২০১২ সালে নিজ শহরেই তাকে মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। গান্টা শহরে তার নিজস্ব বাড়িও ছিল। এটিকে জামা'তের সেন্টার হিসেবে তিনি ওয়াকফ করেন। এই বাড়ির উঠোনেই তিনি ছোটো একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। ধর্মসেবার কাজ করতেন। এভাবে তিনি নিম্বা কাউন্টির প্রথম মোবাল্লেগ হবার সম্মান অর্জন করেন। আমৃত্যু তিনি এখানেই সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। গান্টায় নিজের ব্যক্তিগত জমি জামা'তের মসজিদ ও মিশন হাউসের জন্য দান করেছেন, যার ওপর বর্তমানে কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং রিজিওনাল মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত আছে। একইভাবে মনরোভিয়ার উপকণ্ঠে তিনি নিজের একটি প্লট এবং ছোটো একটি বাড়িও জামা'তকে দান করেন। মরহুম জামা'তের সাথে সর্বদা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক রেখেছেন। এমনকি বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ কাউন্টির প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মিত ভ্রমণ করেছেন, যদিও রাস্তা কাঁচা এবং অত্যন্ত দুর্গম ছিল। তার তবলীগের প্রচেষ্টায় কিছু গ্রামও আহমদীয়াতের ছায়াতলে এসেছে। তিনি নামায, রোযা এবং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন, গরিবদের দেখভাল করতেন। আর্থিক কুরবানীতে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একজন মূসী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তার ওসিয়্যতের হিসাব করা হলে দেখা যায়, প্রায় চার লাখ লাইবেরিয়ান ডলার অতিরিক্ত দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুইজন স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকেও জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ সামিনা ভানু সাহেবার, যিনি লাইবেরিয়ার ডাক্তার ফযল মাহমুদ ভানু সাহেবের স্ত্রী ছিলেন; সম্প্রতি তিনিও মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মওলানা আব্দুর রহিম দার্দ সাহেবের দৌহিত্রি ছিলেন। দার্দ সাহেব এখানেও, অর্থাৎ যুক্তরাজ্যেও মুবাল্লেগ হিসেবে ছিলেন। মরহুমা রাবওয়া থেকে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন, অতঃপর লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ সম্পন্ন করেন। প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ আফ্রিকাতে নিজের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে সব ধরনের প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জীবনযাপন করেছেন এবং সর্বাবস্থায় দৃঢ় ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ওয়াকফের দায়িত্ব সানন্দে ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পালন করেছেন। দাম্পত্য জীবনেও ভালোবাসা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তার এক নিকটাত্মীয় অর্থাৎ তার ভাবি তার সম্পর্কে লিখেছেন, সর্বদা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য অর্থাৎ বংশের লোকজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। সবার সাথে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসা এবং প্রীতিময় সম্পর্ক রাখতেন।

ফ্রেঞ্চ ডেস্কের ইনচার্জ আব্দুল গনি জাহাঙ্গীর সাহেব লিখেছেন, [যেহেতু সামিনা সাহেবার স্বামী ফ্রান্সের অধিবাসী ছিলেন আর তার সাথে জাহাঙ্গীর সাহেবের সম্পর্ক ছিল, এ কারণে সামিনা সাহেবার সাথে তার (জাহাঙ্গীর সাহেবের) মায়ের বিশেষ সম্পর্ক ছিল]। যাহোক, তিনি বলেন, আমি একবার মরহুমাকে জিজ্ঞেস করি, ডাক্তার সাহেবের অবসরের

পর আপনি কি পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া পছন্দ করবেন নাকি মরিশাসে? কেননা মরহুমার শ্বশুরবাড়ি ছিল মরিশাসে। তিনি (সামিনা সাহেবা) বলেন, না, আমি এখন আফ্রিকানই হয়ে গেছি; পাকিস্তানও না মরিশাসও না। আমি আফ্রিকায় থাকা পছন্দ করি আর আমি সর্বদা এখানেই থাকতে চাই। ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষি দেশসমূহে থাকার কারণে মরহুমা ফ্রেঞ্চ ভাষায় পারদর্শী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি (জাহাঙ্গীর সাহেব) বলেন, একবার মরহুমার শাশুড়ি সাহেবা আমাকে বলেন, সামিনা আমার সবচেয়ে প্রিয় পুত্রবধূ, কেননা সে স্বল্পে তুষ্ট থাকে এবং কখনো অভিযোগ করে না। যদিও ডাক্তাররা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকেন, তবুও কিছু কিছু জায়গায় ডাক্তারদের শুরুর দিকে আয় অনেক কম হয়ে থাকে, তখন সামান্য অর্থেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়। অথচ তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে স্বামীকে সঙ্গ দিয়েছেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার স্বামীও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার শাশুড়ি বলেন, একবার মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে আসে; [মেয়েও এখন ডাক্তার হয়ে গিয়েছে আর সে-ও ওয়াকফ করেছে এবং হাসপাতালে সেবা দিয়ে যাচ্ছে, তার নাম আনিলা;] যাহোক, যখন সে স্কুল থেকে ফিরে আসে তখন স্কুলব্যাগটি ছেঁড়া ছিল। তখন নতুন ব্যাগ কিনে দেবার পরিবর্তে মরহুমা নিজের মেয়েকে বলেন, দাঁড়াও, আমি এটি ঠিক করে দিচ্ছি। আর তিনি নিজ হাতে সেলাই করে সেটি ঠিক করে দেন। মরহুমা অত্যন্ত সহজসরল ও পাঁচবেলা নামাযে নিয়মিত, বিনয়ী, অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, স্নেহবৎসল ছিলেন; প্রত্যেকের খেয়াল রাখতেন; দোয়ায় অভ্যস্ত, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, মেহমানদের আপ্যায়নকারিণী, অত্যন্ত সদাচারিণী, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন নারী ছিলেন। শুরুর দিকে যেসব মুরব্বী বুরকিনা ফাসোতে যেতেন তারা আমাকে লিখেছেন, আমরা যখন যেতাম তখন তিনি আমাদের অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন এবং আমরা যারা একা ছিলাম তাদের খাবারের প্রতি তিনি সব সময় খেয়াল রাখতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। মরহুমা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও একজন কন্যা রয়েছে। রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে তার একজন ভাই আছেন ডাক্তার মাহমুদ আতেফ সাহেব। আরেকজন ভাই আছেন মুরব্বী সিলসিলা হামেদ মাকসুদ আতেফ সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা এবং দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)